The environment influences the musical diversity of folk music

Dr. Srabani Sen
Associate Professor, Department of Music, Tarakeswar Degree College
e-mail- dr.ssen8693@gmail.com Mobile no- 6290855102

Folk music is a type of traditional and generally rural music that originally was passed down through families and other small social group. Folk music establishes an important link between environment, culture and society. Musical diversity within folk music is significantly shaped by the environment, reflecting local cultures, traditions and natural surroundings.The natural environment, including landscapes, climate and local ecosystems, plays a big role in shaping the themes, instruments and performance styles of music. The lyrics of numerous folk songs vividly encapsulate the relationship between music and the geographical environment.

লোকসংগীতের সুরবৈচিত্র্যে পরিবেশের প্রভাব

বাংলা লোকসংগীত সংহত সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি। ব্যক্তিপ্রতিভায় সৃষ্ট হলেও সমাজের দশজনের সাহায্যে তা একটা স্থায়ী রূপ লাভ করেছে। মুখে মুখে রচিত আর মৌখিক ধারায় গানের অনুশীলন হয় ও মুখে মুখেই গান গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ে – এটাই লোকসংগীতের বৈশষ্ট্য।

লোকসমাজ গীতি বা গানের মর্যাদা দেয়। অন্য কোন মৌখিক শিল্পের তুলনায় গীতির ব্যবহার লোকসমাজে ব্যাপক। লোকগীতিতে সুর, তাল ও ছন্দের স্বাভাবিক সমন্বয় লক্ষ্য করা যায় । বাংলা লোকগীতির আঞ্চলিক বৈচিত্র্য অতুলনীয়। তবে তা শুধু বিষয়, ভাব, ভাষা, সুর ও তালের মধ্যে আবদ্ধ নয়, তার সঙ্গে স্বর, আসর, পরিবেশ পরিষদের বৈচিত্র্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত । আঞ্চলিক সংগীতের মধ্যে রাঢ়ের পটুয়ার গান, ভাদু, টুসু, জাওয়া, ঝুমুর, পশ্চিমবাংলার আলকাপ, বোলান, পাঁচালী, তরজা, উত্তর বাংলার গম্ভীরা, ভাওয়াইয়া, চটকা, জাগ, পূর্ব বাংলার ভাটিয়ালি, বাউল, শ্যামাসংগীত, রামপ্রসাদী, সারি, ঘাটু, জারি, বিবাহসংগীত, মনসা ভাসান, বিষহরা, পীরকীর্তন,

পদাবলী কীর্তন, গ্রাম্য কীর্তন, কবিগান, রামায়ণ গান, রাম যাত্রা, কৃষ্ণ কীর্তন, গাজীর গান, পালাগান ইত্যাদি যেমন রয়েছে, তেমনি আছে প্রান্তিক জাতি - সাঁওতাল, ওঁরাও, তিব্বতি ভুটিয়া ও নেপালিদের লোকসংগীত ও গানে রয়েছে সুরের বৈচিত্র্য।

এইসব লোকসংগীতের বৈশিষ্ট্যের মূলে আছে সুরের অকৃত্রিমতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা। লোকসঙ্গীতের ভাবের উৎস হৃদয়ের অন্তস্থলে, প্রত্যেকটি আঞ্চলিক সুরে আছে গঠন আকৃতি, গায়কের স্বকীয়তা। এমনকি সুরের আরোহন অবরোহনে আছে প্রচ্ছন্ন প্রভাব। বাংলার জল হওয়ার পরিবেশে পুষ্ট মনের অবচেতনে রুচি-রসবোধ গানের সুরে প্রতিফলিত হয়। বাংলার আকাশ, বাতাস, উন্মুক্ত প্রান্তরে শূন্যতা, ধ্যানগম্ভীরতা যেন মুক্ত হয়ে উঠেছে বাংলা লোকসংগীতের ভাটিয়ালি আর বাউল গানে। উদার সুরে হলেও ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, বাউল সুরের ঢঙ ভাবাবেগে ও স্বকীয়তার বৈশিষ্ট্য পরস্পর পরস্পর থেকে আলাদা। পার্বত্য প্রান্তিক বাংলার ও উপজাতি সাঁওতাল ওঁরাওদের পার্বত্য সুরের উপকরণও সংগীতে রূপ পেয়েছে। অভিনব রূপে তাই রূপায়িত হয়েছে গায়কদের কণ্ঠে।

বাংলায় লোকসংগীতের ধারা বহুমুখী। দৈনন্দিন জীবনের বস্তু আখ্যানের রূপেই শুধু নয়, বহু গানের ভাবই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের তত্ত্বসমন্বিত। কোনও কোনও গান প্রথাগত আচার ও উৎসবে গাওয়া হত। ধর্মীয় জীবন, ধর্মনিরপেক্ষ জীবন, আধ্যাত্মিক জীবন, সামাজিক জীবন এবং প্রতিদিনের আটপৌরে জীবন ছন্দের ব্যঞ্জনাও ফুটে ওঠে লোকসংগীতের মাধ্যমে। প্রত্যেকটি গানই অনুভূতি ও ভাবরসের বৈচিত্র্যে ও অভিনবত্বে ভরা। রচনার পদবিন্যাস সরল, কথা সহজ, সুর স্বতঃস্ফূর্ত। গানের তাল, ছন্দ, লয় সহজ। জটিল তত্ত্বের গানও সহজ কথায়, সহজভাবে রচিত ও রূপায়িত হয়ে থাকে যাতে সাধারণ জনগণের বোধগম্য হয়।

বাংলা লোকসংগীতের সুরবৈচিত্র্যে আছে নদীর গান, আছে মাঠের গান, আছে বিল-হাওড়ের গান, আছে ঘাটের উপযোগী গান, আছে বাটের গান। এছাড়াও পথ চলতি বৈষ্ণব ভক্ত, চাষির ছেলে, রাখাল বালকের কণ্ঠে শোনা যায় নানা দেশজ সুরের গান। বিবাহে আনুষ্ঠানিক অঙ্গ রূপে জল ভরা, ঘাটের পথে ও ঘাটে গিয়ে কণ্ঠ মিলিয়ে সমস্বরে গাওয়া হয় বিবাহ সংগীত। গায়কী রীতিতে গানগুলো হয় আলদা প্রকৃতির। পূর্ববঙ্গে চাষীর ছেলের গানের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের গাওয়া গানের মিল পাওয়া যায় না। পূর্ববঙ্গের মাঠের গানের সুর ভাটিয়ালি মিশ্রিত, আর উত্তরবঙ্গে ভাওয়াইয়া সুর বৈশিষ্ট্যযুক্ত। ভাওয়াইয়া গানে নারী অন্তরের বিচ্ছেদ-বেদনার দীর্ঘশ্বাসের হতাশা ফুটে ওঠে। আবার বাউল সুর অন্য সুর থেকে আলাদা। এমন কি প্রত্যেক অঞ্চলে গানের পদবিন্যাসে আছে স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য। যেমন- ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া প্রভৃতি নদী মাঠের গানে আছে উদাস ভাব, সেরকম রামপ্রসাদী ও বাউল গানে আছে ভাবের বৈরাগ্য। কোন গানের ছন্দ তালহীন, মন্থরগতি আবার ঝুমুর, সারি, জারি প্রভৃতি গানে আছে ছন্দের বলিষ্ঠতা। আবার বাউলদের দেহতত্ত্বের গানে,গুরুবাদ

ও সাধন রহস্যের গানে আছে ভাব গভীরতার তত্ত্ব । কোনও কোনও গান ধর্মীয় আচার—আচরণযুক্ত। যেমন-কীর্তনগান। আবার কোনও কোনও গানের গায়কী রীতি আবৃত্তিমূলক, কথকতা, রামায়ণ, কীর্তনে দেখা যায় । তাল, ছন্দ, সুর, বাঁধুনি- পদবিন্যাসের নানা বৈচিত্র্য লোকসংগীতর ভাণ্ডারপূর্ণ। উৎসবে, ধর্ম, চিন্তায়, সুখে-দুঃখে, জন্ম- মৃত্যু, বিবাহ থেকে শুরু করে দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ ঘটনার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় গানের মাধ্যমে। বাংলা লোকসংগীত আধ্যাত্মিক অনুভূতিলব্ধ অভিজ্ঞতা ব্যঞ্জনার বাহন।

নদীর গান, মাঠের গান, আঙ্গিনা, অন্তরের গান শুধু সুরেই নয়, পরিবেশ, শ্রোতৃবৃন্দ ও গায়কিতে ভেদ লক্ষ্য করা যায়। ধান কাটার সময় চাষিরা গান গায় বা একক কণ্ঠের ভাওয়াইয়া গানের সুরের রেশের কম্পন উন্মুক্ত মাঠে ঘুরে বেড়ায়। আবার আঙ্গিনা বা প্রাঙ্গনে যে গান হয়, তার পরিবেশ ও শ্রোতৃবৃন্দ আলাদা হয়ে থাকে। পথ চলতে চলতে একাকী গেয়ে চলে বাউল। ঢাক বাজিয়ে, গোষ্ঠীবদ্ধ গাজন সন্ন্যাসী নীল গাজনের গান গায় । আবার প্রাঙ্গণে শামিয়ানা বেঁধে চলে যে কবিগান তার পরিবেশ ও হয় ভিন্ন । গানের আসরের পরিবেশ কখনও বউ-ঝি, বৃদ্ধবনিতা -পরিবেষ্টিত, কখনো চঞ্চল মুখর বহুজনবেষ্টিত, আবার কখন বা আসর, নির্জন গ্রাম্যপথ, পরিবেশের প্রভাব সুরে প্রচ্ছন্ন থাকে। বাউলর গানে উদাস ভাব, ভাটিয়ালি গানে বৈরাগ্য, ভাওয়াইয়া বিচ্ছেদব্যথার সুর ধ্বনিত হয়ে ওঠে। নিস্তব্ধতারও রূপও ফুটে ওঠে নদীর গানে, পরিবেশের সাহায্যে।

পরিবেশ ভাব ও রস সৃজনের সহায়ক। নদীতে গাওয়া গানের পরিবেশের আলোচনা প্রসঙ্গে গানের রূপাবয়বচিত্রের তারতম্য(দিনে ও রাত্রিতে নদীর রূপের) লক্ষ্য করা যায়। রাত্রি শেষের শান্ত ভাব সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কর্মমুখর চঞ্চল হয়ে ওঠে। গানের সুরেও তা প্রকট হয়। নদীমাতৃক বাংলায় নৌকাতে নদী পথে রাত শেষের শান্ত নিস্তব্ধতা ধরা দেয় 'ঝপ ঝপ' জলে নাওয়ার শব্দে -

ঝপ ঝপ ঝপ
ঝপ ঝপ ঝপ

আবার হঠাৎ শুনতে পাওয়া যায় কান্না সুর - অন্ধকারের বুক চিরে আসছে গানের প্রথম কলির সুরের দীর্ঘরেশ মাত্র। গাইছে নৌকার কোনও মাঝি বা তীরে বসে বা কোন মৎস্য শিকারি-

দাও খুইলে দাও মন্দিরার কেওয়ার
লাগুক শীতল হাওয়া রে
রাইত তুই যারে যা পোহাইয়ে। ১

অথবা

বেলা গেল সন্ধ্যা হইল

গৃহে জ্বালাও বাতি।

না জানি অবলার বন্ধু, আসবেন কত রাতি রে ।।

রাইত তুই.....।।২

কবিদের আকুল প্রার্থনা যেন ভিন্নভাবে রূপ পেয়েছে পল্লী- কবির গানের পদে -

রাইত না দুই প'রের অইল,ডালে ডাকে কুয়া

অঞ্চল বিছায়ে নারী' কাটে চিকন গুয়া রে।। ৩

অথবা

রাইত পরভাত অইল, কোকিল করে কুয়া।

খুইলে দাও মন্দিরার কেওয়ার লাগুক শীতল হাওয়া রে

রাইত তুই যারে যা পোহাইয়ে।।৪

অবসন্ন, ক্লান্ত অন্তরাত্মাকে নদীর শীতল হাওয়ার স্পর্শে, শীতল করার জন্য শুধু নয়, রাধাভাবে ভাবিত বিচ্ছেদ বিধুরা পল্লীবালার মনের অবস্থা ছবি ফুটে উঠেছে কবি কল্পনায়। রাত্রিশেষে প্রভাতের নির্দেশসূচক কোকিলের কুহুধ্বনিও প্রকৃতির বুকে সুরের জাল বোনে।

বাংলার নদীর গানের খুব প্রসিদ্ধি। নদীতে বিভিন্ন ছন্দ সুরে গাওয়া হয় গান। বর্ষার জলে বিল, খাল, নদী, হাওর জলে ভরে ওঠে কানায় কানায়। নদীতে মাঝি নৌকায় পাল তুলে দিয়ে, বইঠা ধরে কর্মহীন নিঃসঙ্গ অবসরে টানা সুরে গেয়ে চলে ভাটিয়ালি গান গায়। স্বরের কম্পনের রেশ, নদীর এক পাড় থেকে অন্য পাড়ে বাতাসে ভেসে বেড়ায়। সুর যেন তালহীন স্বচ্ছন্দগতিতে চলে। মন্থর গতিতে অলস ভাবে মাঝি গায়-

ও রঙ্গিলা নায়ের মাঝি

আবার কখনও গায়

কোন দরিয়ায় পারে গো থাক। ৫

সারি গান অর্থে নদীর গানই বোঝায়। সারিগান পল্লীগীতির কোমল ভাব ও লয়ের পরিবর্তে দৃপ্তপৌরুষব্যঞ্জক দ্রুতলের গান। পূর্ববঙ্গে ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ছাড়া ও নিম্ন বংগের যশোর-খুলনায় এর প্রচলন আছে। সারিগান কর্মের সহায়ক। সারিগান বৃন্দ বা সমবেত কণ্ঠের। গানের উৎপত্তি - নদী, খাল, বিল ও নৌকার অনুষঙ্গ। গানের তালও সবসময় সমান নয়, নৌকার গতির সঙ্গে সংগতি রেখে তালের হেরফের হয়ে থাকে। সমতালে দাঁড় ফেলার তালের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে সে গান পুষ্ট। দলবদ্ধভাবে গায় আর তালে তালে বৈঠা ও দঁড় টানে, 'হেঁই-হেঁইয়ো হেঁইয়া', 'হেঁই-

হেঁইয়ো হেঁইয়া'- গানের ছন্দে ও তালে ক্লান্তির অপনোদনের রপ ধরা পড়ে গানে। মনসার ভাসান শ্রাবণ সংক্রান্তি, ভরা বর্ষায়, বিজয়া উপলক্ষ্যে নৌপ্রতিযোগিতায় সারিগান শুনতে পাওয়া যায়। ভাটিতে নৌকা নিরুদ্দেশে ভাসিয়ে দিয়ে নির্জন নিঃসঙ্গতায় সুরের আগল খুলে দিয়ে ভাটার টানে নৌকা আপন গতিতে এগিয়ে চলে। মাঝিকে নিশ্চিন্ত মনের গভীরে ডুব দেওয়ার অবসর দেয় এবং সেই তল থেকে যে গানের সুর উছলে ওঠে, তাইই ভাটিয়ালি গান।

বিল হাওরের দিগন্ত বিস্তারী জলরাশির উপর নাইয়া নৌকার হাল ছেড়ে দিয়ে ধীর গতিতে এগিয়ে চলে। দেহ-মন ক্লান্তিতে অবসন্ন ও উদাস। নিঃসঙ্গতার ভার লাভ করতে মাঝি গান ধরে। ক্লান্ত, নিঃসঙ্গ অলস মুহূর্তের বেদনাকে রূপায়িত করে ভাটিয়ালি সুর-

বন্ধু, কই রইলা রে-
অকূলে ভাসাইয়া, বন্ধু, কই রইলা রে।
লহর দরিয়ার বুকে মইলাম সাঁতারিয়া,
কি দুখ বুঝিবে বন্ধু কিনারায় দাঁড়াইয়া।
বন্ধু, কই রইলারে!
বন্ধুরে কুল নাই কিনারা নাই
উঠছে কত ঢেউ,
এমন নিদান কালে
সঙ্গী নাই মোর কেউ
বন্ধু, কই রইলারে। ৬

আকুল জলরাশির শীতল সান্নিধ্য নীরস মনকে শান্তি দেয় না। প্রেমের বেদনা বিরহের ভারে মধুর হয়ে ওঠে। লোকগীতি একক সংগীত তাই মনের গভীরে আন্দোলন তোলে।

বর্ষার জলে কানায় কানায় ভরে ওঠে মাঠ। প্রত্যুষের আলো–আবছায়া আলোতে ছোট নৌকাখানি নিয়ে বিলের মধ্যে দিয়ে ভেসে চলে চাষির ছেলে। সে গায়-

মনের মানুষ পায়না জগতে
ও ললিতে
মনের মানুষ জলের ঘরে
নিত্য রাসে খেলা করে
আমার জোড়র গুটি, বেজোড়হইলো কি করে
ও ললিতে।
মনের মানুষ পায়না জগতে।৭

সারা বিল জুড়ে ভেসে বেড়ায় সে সুরের কম্পন। তন্দ্রাতুর শ্রোতার মনে শিহরণ জাগায়। স্তব্ধ হয়ে শ্রোতা শুনে, আর ভাবে সে গানের অন্তর্নিহিত তত্ত্বের কথা।

মাঠের গানেও পাওয়া যায় প্রেমভাব –

দক্ষিণা বাতাসে নারীর পরাণকান্দে রে।
কান্দে নারীর পরাণ, বন্ধুর লাগি রে।।৮

উত্তরবঙ্গের মাঠের গান ভাওয়াইয়া। রংপুর, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার অঞ্চলের জনপ্রিয় গান ভাওয়াইয়া। 'ভাওয়া' শব্দ থেকে এই গীতি নামের উৎপত্তি। এ গানের পরিবেশ ও সুরের মাদকতা গানকে অন্য মাত্রা দিয়েছ। এ গান নির্জন মাঠে গাওয়া গান। 'কাশ', নলখাগড়ার জলাভূমি বা বিস্তীর্ণ চর, দুয়ার অঞ্চলের অত্যন্ত খরস্রোতা নদনদী, বর্ষার প্লাবন, নদীর মরাঅংশের নিচু জলকাদায় গজিয়ে ওঠা কাশিয়ার জঙ্গলকে মহিষের আদর্শ চারণক্ষেত্র-ভাওয়াইয়া গানের সামগ্রিক রূপ হয়ে ধরা দেয় । এ গানের অন্য নাম পাথারিয়া। পাথার অর্থে সাগর, এখানে মাঠ নির্জনতার পাথার। সেখানে যে গানের উদ্ভব তা হয়েছে পাথরিয়া । এই গানের অন্য নাম বাওয়াইয়া, বাউদিয়া ইত্যাদি । মোষচারণের সময় মৈষাল দোতরা বাজিয়ে গায়, ফন্দি বা মাহুত হাতি খেদার ফাঁকে গায় এ গন গায়। গাড়ির চালক গাইতে গাইতে গাড়ি চালায়। ভাওয়াইয়া গানের মধ্যে মৈষাল বন্ধুর গান সবার সেরা। বনের মধ্যে উঁচু খোলা ভূমিতে বাথান হত। মহিষের সঙ্গে মাঠে গিয়ে সবুজ ঘাস পেলে, গাছের তলায় বসে গানের তারে বন প্রান্তরকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় এই ভাওয়াইয়া গান। চরেতে নিঃসঙ্গ অবসরে মহিষ চরাতে চরাতে দোতারার স্বর তুলে টানা সুরে গায়ক গায় মইষাল গান-

মইষাল মইষাল কর বন্ধু রে
ওরে শুকনা নদীর কূলে।
মুখখানি শুকাইয়া গেছে- চৈত্ মাইস্যা ঝামালে
প্রাণ কান্দে মইষাল বন্ধুরে –
আমার বাড়িত যাইও বন্ধুরে, এই না বরাবর
কলা গাইছ্যা বাড়ি আমার, পুব দুয়ারি ঘর –
প্রাণ কান্দে মইষাল বন্ধুরে - ৯

এই গানগুলি বাণীতে যেমন সমৃদ্ধ, সাহিত্যরূপে অনন্য। নিসর্গ প্রকৃতি ও মানব–মনের সূক্ষ ভাবরসে পূর্ণ এই গান –

তিস্তা নদীর ধারে ধারে ও মোর বাই গে,

না জানি মৈষাল বন্ধু মোর চরেবার আসে।। ১০

খরস্রোতা নদীগুলি যেমন সহসা বাঁক নেয়, সেই অশিষ্টতা গলা ভাঙ্গায় ধরা পড়ে। এই গলা ভাঙ্গা প্রান্ত উত্তরবঙ্গের নৈসর্গিক ও ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য থেকে এসেছে। ক্ষীরোল অঙ্গের ভাওয়াইয়ায়- মৈষাল, সোয়ারীচাল ও গাড়িয়াল বন্ধুর গানে লয় বিস্তারে তারতম্য ঘটে,প্রেমের আনন্দ- উচ্ছ্বাস এই গানে প্রাধান্য পায়।

ভাওয়াইয়া গানের প্রেম - মানুষের প্রেম। নারী হৃদয়ের বিচ্ছেদ বেদনা ও ব্যথাতুর ভাবটাই ভাওয়াইয়ায় গাওয়া হয়।অধিকাংশ পদই নারীহৃদয়ের বেদনা সংক্রান্ত ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ ব্যথার অনুভূতি থেকে উদ্ভূত। আর নারী মনের এই ভাববেদনা গায় পুরুষ।

উত্তরবঙ্গে কোচবিহার জলপাইগুড়ি অঞ্চলে ক্ষিপ্রতালে লঘুচন্দে লঘু রসের চটকা গানে আছে বাস্তব জীবনের অভ্যস্ত পথের উচ্ছল প্রকাশ। জীবনযাত্রার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার ভাব ও অনুভূতিকে কেন্দ্র করে এই গান রচিত হয়, তাই আনন্দ এর সহজাত।

আমার বাংলায় করে মন ফাঁপর, চলো যাই কলকাত্তা শহর।
শহরে ভাড়া করলাম ঘর দোতলার উপর।
দিনে দিনে গিন্নির করে মন ফাঁপর। ১১

বাংলা জনসাধারণের সঙ্গে উমা সংগীত ও আগমনী গানের নিবিড় সম্পর্ক। স্নেহ, করুনা, বাৎসল্য রসের অপূর্ব নিদর্শন উমা সংগীত। মা মেনকার মাধ্যমে বাংলার কন্যাবিরহবিধুর মায়েদের কান্নার রেশই শুনতে পাওয়া যায়। মর্মবেদনাই, সুরে প্রচ্ছন্ন থাকে, তাই আগমনী গানের আবেদন বাংলায় সর্বজনীন। পদযোজনায় সারল্য আন্তরিকতার স্পর্শ গানের রূপায়িত হয়েছে-

স্বপনে দ্যাইখ্যাছি উমা প্রাণটা আমার জ্বলতেছে।
শীঘ্র করি যাও গো গিরি, উমাধনকে আনিতে। ১২

আগমনীর অনেক গান গাঁয়ের বৌ- মেয়েদের মুখে মুখেই রচিত, কথা সহজ, কিন্তু আন্তরিকতার স্পর্শে নিবিড় বাৎসল্য রসেপুষ্ট।

বিবাহে বরণ কুলো, কড়িখেলা, দধিমঙ্গল ইত্যাদি নানা আচারের উপযোগী গান রচনা করে মেয়েরা বিবাহকালে গায়। গাওয়ার রীতি ও সুরের আঞ্চলিকতা লক্ষ্য করা যায়-

অধিবাস কইরে জামাই না লয় ঘরবাড়ি
জল ভরতে নদীতে যায়।
পান দিলাম বিড়ি বিড়ি গুয়া উত্তম ফল
রাজহংসের ডিম্ব দিলাম গঙ্গার নিমন্ত্রণ।

পরন শাড়ি নীলাম্বরী ওড়না দিয়ে গায়
সখির সঙ্গে মনোরঙ্গে জল ভরিতে যায়।। ১৩

গায়ে হলুদের প্রসঙ্গে গায় –

হলুদি মাখিয়া অঙ্গে দেখেক চক্ষু তুলি
ওরে কান্দিয়া পোহাইছিস নিশি
কারবা হিয়া বুলি রে-
ওকি পেন্দেক, পেন্দেক হলদি পেন্দেক অঙ্গভরি।
ডাইন হস্তে হলদি নিয়া বাম হস্তে পেন্দে
তোমার চোক্ষের চাউনি আজি কারবা বুকে বেন্দে রে –
পেন্দেক-পেন্দেক –

স্নান শেষে কন্যার সাজার সময় গায়-

সাজ সাজ ধনি,বেঁধে মোহন বেণি
সাজাইব রস বৃন্দাবন। ১৪

পরিবেশ, আচার অনুষ্ঠানের সাজুয্য রেখেও গম্ভীরা সার্বজনীন শিল্পকৃতিতে পরিণত হয়েছে। শিবের মূর্তি স্থাপন করে আসর বসানো-নাট্য আঙ্গিকে নাচ- গান- বাজনা- সংলাপ গম্ভীরা গানকে নবরূপ দিয়ছে।

টুসু শস্যের দেবী, পৌষ মাসে ব্রত পালন করে, পৌষ সংক্রান্তির দিনে ব্রত সমাপ্ত করে -

তোষলা গোড়ায়
তোমার দৌলতে আমরা ছ'কুড়ি পিঠা খাই।১৫

বিসর্জনের আগের রাতে টুসু জাগরণে গানে করুণ আর্তি ধরা পড়ে-

আমার টুসু ধানে,বিদায় দিয়ে ঘরে যাবে কেমনে?
শাঁখা দিলাম, সিন্দুর দিলাম গো, আলতা দিলাম চরণে
মনে বড় দুঃখ হয় ফিরে যেতে ভবনে। ১৬

বিসর্জন শেষে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বাড়ি যায় সকলে

তুষ কড়ি দিয়ে তুষু পাতানো হয়। গায়-
তুষালো গো রাই, আমরা গাঙ সিনানে যাই

গাঙের জলে রাধি- বাড়ি
মকরের জল খাই। ১৭

ভাদু উৎসব পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষত বীরভূম বাঁকুড়া বর্ধমান জেলার অন্যতম প্রসিদ্ধ লোক উৎসব । কুমারীয় সদ্যবিবাহিত মেয়েরাই মুখে মুখে গানে অংশগ্রহণ করে। ভাদুকে কন্যারূপে পূজা করে গায় আগমনী গান, বন্দনা গান। গানের কথায় অবচেতন মনের বাসনাই রূপ পায়।, ভাদু বিসর্জন কালে করুণ সুরে গায়-

ভাদু তোমায় বিদায় দিব কেমনে
চলে গেলে প্রাণ ত্যজিব –
কাজ কি ছাড় এ জীবনে? ১৮

ব্রত উপলক্ষ্যে আছে পড়শিদের গান। কুমারী মেয়েদের অবচেতন মনের আকাঙ্ক্ষা কামনাও ছড়াকারে ব্রতের মন্ত্র সুর করে আবৃত্তি করে ব্রতীরা। মাঘ মন্ডল ব্রতকালে এক মাস ব্রত উদযাপনের পর সংক্রান্তির দিনে ব্রতের শেষে নদীতে যায় ভেওরা ভাসাতে। তারা একটানা সুরে গায় –

ভাসাইয়া দাও গো, চম্পা তোমার
চৌদ্দ ডিঙার ভেলা
জ্বালাইয়া দিও মশালখানি, ভাসাইবার বেলা।
জ্বালাইয়া দিও –১৯

লোকসংগীতে সুর, তাল ও ছন্দের সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। সাধরণ মানুষের মুখে রচিত, সহজবোধ্য সুরে কত সহজেই ব্যক্ত হয়েছে লোকজ সংস্কৃতির রূপ। তাই বলা যায় লোকসংগীত কোন দেশ-কালের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। আঞ্চলিকতার বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ ভাব, ভাষা, সুর, তাল ও পরিবেশের সংস্পর্শে লোকসংগীত তাই হয়ে উঠেছে বিশ্বের আপামর মানুষের সংগীত।

তথ্যসূত্র

১। বাংলার লোকনৃত্য ও গীতিবৈচিত্র্য - পৃঃ-১৪২
২। বাংলার লোকনৃত্য ও গীতিবৈচিত্র্য - পৃঃ-১৪২
৩। বাংলার লোকনৃত্য ও গীতিবৈচিত্র্য - পৃঃ-১৪৪
৪। বাংলার লোকনৃত্য ও গীতিবৈচিত্র্য- পৃঃ-১৪৪
৫। ভাটিয়ালি -পৃঃ-১৭৯

৬। ভাটিয়ালি -পৃঃ-২৮২
৭। বাংলার লোকনৃত্য ও গীতিবৈচিত্র্য- পৃঃ- ১৫১
৮। বাংলার লোকনৃত্য ও গীতিবৈচিত্র্য- পৃঃ- ১৫৫
৯। ভাওয়াইয়া গানের আঙিনায়- পৃঃ-২৫
১০। ভাওয়াইয়া গানের আঙিনায়- পৃঃ-৩০
১১। বাংলার লোকনৃত্য ও গীতিবৈচিত্র্য- পৃঃ-২৯১
১২। বাংলার লোকনৃত্য ও গীতিবৈচিত্র্য - পৃঃ-১৮৫
১৩। বাংলার লোকনৃত্য ও গীতিবৈচিত্র্য - পৃঃ-১৮৬
১৪। বাংলার লোকনৃত্য ও গীতিবৈচিত্র্য- পৃঃ-১৮৬
১৫। বাংলার লোকনৃত্য ও গীতিবৈচিত্র্য- পৃঃ-১৭০
১৬। ভাদু ও টুসু - পৃঃ-২৫
১৭। ভাদু ও টুসু - পৃঃ-৩০
১৮। ভাদু ও টুসু - পৃঃ-৩৫
১৯। বাংলার লোকনৃত্য ও গীতিবৈচিত্র্য- পৃঃ-২৯৬

সহায়ক গ্রন্থ

১। ভট্টাচার্য আশুতোষ – বাংলার লোকসংস্কৃতি, ন্যাশানাল বুকট্রাস্ট, নয়াদিল্লি
২। বর্ধন মণি–বাংলার লোকনৃত্য ও গীতিবৈচিত্র্য,লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র,২৯ জুলাই ১৯৬১
৩। ভৌমিক প্রবোধকুমার–বাংলার লোকদেবতা ও সমাজসংস্কৃতি, আনন্দপাবলিশার্স প্রা.লি.,কলকাতা
৪। সিংহ শান্তি – টুসু, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র,তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, ১৪০৫
৫। চৌধুরী রামশংকর- ভাদু ও টুসু, কথা শিল্প, কলকাতা, ১৯৮১
৬। ভাটিয়ালি গান-দিনেন্দ্র চৌধুরী, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, জানুয়ারি ২০১৩
৭। রায় দীপক কুমার – ভাওয়াইয়া গানের আঙিনায়, টেরাকোটা, ২০২০